ইলিয়াসের সংশয়, দ্রোহ ও স্বপ্ন বিষয়ে একটি ভাসা ভাসা প্রতিবেদন

মামুন হুসাইন

'ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে একটি প্রবন্ধ ফেঁদে বসা বেয়াদবির শামিল, এ ধরনের কম্ম ঘটান মস্ত মস্ত পণ্ডিত-সমালোচকরা, তাঁদের কাছে বিদ্যাচর্চা মানে ছুরি-কাঁচি নিয়ে শিল্পীদের ময়নাতদন্তে নামা। কিন্তু আমি আমার মাতৃভাষায় তোতলাতে তোতলাতে গল্প-উপন্যাস লেখার চেষ্টা করি; কানা হোক, খোঁড়া হোক, সেগুলো আমার অনেক কষ্ট, অনেক সুখ, অনেক পুলক ও অনেক উত্তেজনার প্রকাশ; তাই ঐসব অজর, অজয় ও চোখে-পিঁচুটি-জমা মহাপণ্ডিতদের অত কঠিন কঠিন দায়িত্ব নেওয়া কি আমার পোষায়?'

ইলিয়াসের মতো তীব্র প্রাণশক্তিসম্পন্ন মানুষ যখন লেখার এই দায়ভার নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন, তখন আমার মতো অর্বাচীন ও সদা দোদুল্যমান চরিত্রের মানুষটির পক্ষে এ রকম এক বিদ্বৎসমাজে প্রবন্ধ উপস্থাপন বিপুল ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্যোগময় ঘটনাই বটে। ইলিয়াস এইসব বাচালতাকে বরং অবজ্ঞাই করেছেন– all cough in ink! আমি ভয়ে ভয়ে রাজি হয়েছি বা রাজি হতে বাধ্য হয়েছি, মূলত আপনাদের সাহচর্যের লোভে; কিংবা আরও স্পষ্ট অর্থে, ইলিয়াস নামক আমাদের ভাষার, আমাদের কালের এক মহিরুহকে স্পর্শ করার গৌরব অর্জন করার জন্যই; আরজ আলী মাতুব্বরের ভাষায় বলি, 'পুস্তক প্রণয়নের জন্য নহে, স্মরণার্থে।' কথা বলবার এই সুযোগ, এই প্রশ্রয়, কথা শোনার এই ক্লেশ-যাতনা আয়োজকবৃন্দ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঘটিয়েছেন, এজন্য তাঁদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা ও সম্মাননা জ্ঞাপন করছি। মন্বন্তরের বছর জন্ম নেওয়া একজন মানবশিশু গাইবান্ধার সাঘাটা গোটিয়া হয়ে, ক্ষুধা-মৃত্যু বাঁচিয়ে, বগুড়া-ঢাকা হয়ে, কলকাতা হয়ে একদা পুণ্ড্র শহরের ঠনঠনিয়া গোরস্তানে তাঁর ট্রাভেলগ সমাপ্ত করে কিভাবে বাংলা জনপদের কাছে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস' নাম ধারণ করলেন তা নিয়ে আমি বিস্তর ধন্দে পড়ি।

ইলিয়াস এযাত্রা নিজেকে খানিকটা মেলে ধরায় আমাদের স্বস্তি হয়, সাহস হয় এবং তৎক্ষণাৎ আমরা ওঁর কাল এবং রূপান্তরের জগৎ খানিকটা আঁচ করতে শিখি– *'...আমার জন্মের ঠিক সাড়ে চার বছর পর স্বাধীনতা আবির্ভূত হলেন। সঙ্গে এলেন কে? না, দাঙ্গা। যে বিপুল জনগোষ্ঠী স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে তারাই আবার দুটো সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে একে অপরের ঘাড় মটকায়।...স্বাধীনতা আসে, সঙ্গে গৃহহীন হয় কোটি কোটি মানুষ। কোনটাকে গুরুত্ব দেব? যে লোকটি নিজের বন্ধুর হাতে খুন হয় তার কাছে নিজের প্রাণের দাম কি স্বাধীনতার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল? স্বাধীনতা যে মানুষের মুক্তিকে সঙ্গে করে আনেনি তা বুঝতে বেশিদিন লাগল না।...ভাষা আন্দোলনের বিজয় দেখতে না দেখতে নেতাদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়, বড়ো নেতাদের ছোটোলোকামি দেখে কে বলবে যে এদেরই সামনে রেখে দেশের মানুষ কী শক্ত দুর্গের পতন ঘটিয়েছিল, এদের মারামারি উছিলা করে, আসে সামরিক শাসন। কৈশোর পার হচ্ছি তখন, সদ্য কলেজে ঢুকেছি, ওই যে সেনাবাহিনীর থাবার নিচে পড়লাম, সারাটা যৌবনকাল চলে গেল তারই সাঁড়াসির ভেতর..., আজও তা থেকে রেহাই মিলল না। মার্শাল ল'র জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে যে কিশোর পরিণত হলো যুবকে, যৌবনকাল পার করে দিয়ে আজ সে পক্বকেশ প্রৌঢ়, তার বৃদ্ধি কি আর পাঁচটা দেশের মানুষের মতো হতে পারে? তার ক্ষোভ, গোঙানি, তার ব্যর্থতা, তার অসহায়ত্ব, তার অসন্তোষ– এসবই কি আমার সময়ের প্রধান পরিচয়?'* ইলিয়াস ওঁর পরিচয়পর্ব নিয়ে, ওঁর আইডেনটিটি নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, ততদিনে একক উদ্যোগে অনেকখানি, বুশওয়াকিং করে ফেলেছেন।

মার্শাল ল'র জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে যে কিশোর পরিণত হলো যুবকে, যৌবনকাল পার করে দিয়ে আজ সে পক্বকেশ প্রৌঢ়, তার বৃদ্ধি কি আর পাঁচটা দেশের মানুষের মতো হতে পারে?

আমার বলার অপেক্ষা থাকে না, এই সভার সকল মানুষের মতো মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'মাষ্টারসাব' উপন্যাসটি ইলিয়াসকে উৎসর্গ করার সময় ইলিয়াসের এই নিঃসঙ্গ যাত্রাকে সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করলেন– *'...কি পশ্চিম বাংলা কি বাংলাদেশে সবটা মেলালে তিনি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক। আমার চেয়ে অনেক বড় লেখক।'*

বড় লেখক, ছোট লেখক বা নিতান্ত পটবয়েলার–লেখককুলের এই শ্রেণিবিন্যাস, কৌলীন্য এবং হায়ারেরকি নিয়ে, এই মুহূর্তে নতুন তর্কে না জড়িয়ে আমি আবারও ভেবেছি– 'স্বগতঃ মৃত্যুর পটভূমি' বর্ণনা করতে করতে গল্পকার ইলিয়াস, ঔপন্যাসিক ইলিয়াস কেন ক্রমশ ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বৈরাচার, সেনাবাহিনী, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, ভারত বিভাগের রাজনীতি, পার্বত্যভূমির হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি বিবিধ প্রপঞ্চ নিয়ে সোচ্চার হচ্ছেন, এমনকি পত্রিকার হয়ে, সংগঠনের হয়ে দাবিপত্র ও ঘোষণাপত্র তৈরি করছেন তীব্র তৎপরতায়। ওঁর কাছের মানুষ, মাহবুবুল আলম, যাঁকে তিনি 'খোয়াবনামা' উৎসর্গ করেছেন, আমরা বলতাম জিনু ভাই– কিঞ্চিৎ নেমড্রপিংয়ের ঝুঁকি নিয়েই এই নিভৃতচারী-সংবেদনশীল প্রয়াত মানুষটির একটি কথা এই ক্ষণে মনে করি– *'যখন ইলিয়াস প্রথম গ্রন্থের লেখাগুলো তৈরি করছেন, তখন ইলিয়াস কদাচিৎ সাহিত্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠান-আন্দোলনে যোগদান করতেন।'* আর আমরা যখন ইলিয়াস-বিদ্যাপীঠের দুর্বল ব্যাকবেঞ্চার, ইলিয়াস তখন অনুষ্ঠান-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছেন। গল্প-উপন্যাসের বাইরে আমরা সেই প্রথম আবিষ্কার করি–তিনি ছোটগল্পের মৃত্যুদশার সুলুকসন্ধানে নেমে আবিষ্কার করে ফেলেছেন আমাদের নতুন-পুরনো অনেকগুলো সংশয়রাজ্য; আর কে না জানে, এই 'সংশয়ের পক্ষে'ই তিনি আমৃত্যু তাঁর স্বাক্ষরদান অব্যাহত রেখেছেন। লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, গান্ধী, বঙ্কিম, মীর মশাররফ, আরজ আলী, ঢাকার নবাব-বাহাদুর, গুন্টার গ্রাস, চাকমা জনপদ, উদ্বন্ধনে হত্যা হয়ে যাওয়া কায়েস আহমেদ, কস্তা গাভরাস, বা মহাশ্বেতা কথিত 'অর্থপূর্ণ ভায়োলেন্স' খুঁজতে খুঁজতে তিনি মানুষ পারাপারের এক বিপজ্জনক সেতুর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন।

এই নড়বড়ে সেতুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি একদিকে যেমন ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, প্রশ্নবিদ্ধ; অন্যদিকে তাঁর রাগী চোখ দেখতে শুরু করেছে রাজ্যের স্বপ্ন–আমাদের দেশকাল নিয়ে, আমাদের ঘরবাড়ি নিয়ে, আমাদের অন্তর্গত জগৎ নিয়ে দেখা সেইসব স্বপ্ন তিনি ইতোমধ্যে ফেরি করতে শুরু করেছেন; এমনকি গ্রেট ক্যালকাটা-কিলিংয়ের শহরে তাঁর দক্ষিণমুখী পা বিসর্জন দিয়েও স্বপ্ন-বর্ণনার জিদ অব্যাহত রেখে গেছেন আমাদের স্বপ্নহীন জনপদে। দেখা যাবে, ক্রাচে ভর দিয়ে সেতু পেরোনোর অনেক আগেই, বাংলা ভাষায় তিনি প্রথম 'সংস্কৃতি' ও 'সেতু' শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করলেন–'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু!' পিঁচুটি-জমা চোখ দিয়ে একদা আমরা বাল্যশিক্ষার পাঠশালায় শিখেছিলাম, 'সেতু'র বদলে ব্রিজ, সাঁকো, কালভার্ট, পুল বা পোল হয়। আমরা শিখেছিলাম, সেতু তৈরি হয় কাঠ, লোহা, বালি, সিমেন্ট বা সুরকি দিয়ে। আমরা শিখেছিলাম, গ্রামের মানুষ

সমবায়ী কৃষকের মতো বাঁশ, পেরেক ও দড়িদড়া জমা করে সাঁকো বানিয়ে খাল-নদী পারাপার হয়। আমরা শিখেছিলাম, এই সেতু পেরিয়ে স্রোতস্বিনী নদী থেকে জল আনতে হয় কুমড়োবড়ি তৈরির অন্যতম প্রধান অনুপান হিসেবে। আমরা শিখেছিলাম, সেতু পেরিয়ে, সেতুর নিচে বহমান জলস্রোতে, ডিম দেওয়ার পর ক্লান্ত জবুথবু মা-মুরগিকে তার জাড্য দূর করার জন্য স্নানকার্যে লিপ্ত করা হয় বাধ্যতামূলক। আমরা শিখেছিলাম, রেল সেতুর ওপর ট্রেন চড়লে বহুদূর থেকে গুমগুম শব্দ হয়। আমরা শিখেছিলাম, মক্তব থেকে, স্কুল থেকে ফেরার কালে, সাঁকো দুলিয়ে ভয় দেখানো যায় সহপাঠীকে, অথবা গোপন বুলিং-এ শৈশব-কৈশোরের অপেক্ষাকৃত অন্তর্মুখী বন্ধুটিকে নাজেহাল করতে করতে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেওয়া যায়; তখন বন্ধুর প্রিয় পাঠ্যপুস্তক, পরম প্রভুর ঐশীবাণীসমৃদ্ধ আমপারার আরবি অক্ষর অথবা মাথার নিরুপায়-টুপি জলের স্রোতে ভাসতে থাকে উজ্জ্বল-সবুজ ঘাসপাতার মতো । আমরা শিখেছিলাম, বড় সেতু তৈরির আগে শহর-গাঁয় ছেলেধরা নামে গোপনে। আমরা শিখেছিলাম, সেতু তৈরির আগে নদী শাসনের জন্য দরকার হয় মানুষের শরীর এবং রক্তপাত। হয়তো ধানক্ষেত, নদী ও খাল হত্যা করে তখন দু-একটি সেতু তৈরি হয় অথবা দু-একটি সেতু তৈরির আয়োজন নদীর তীব্র কান্নায় মানুষ তক্ষুনি বিস্তৃত হয়। সেতু তৈরির আয়োজনে হয়তো তখন বিশ্বব্যাংক আসে, হয়তো 'সাঁকো' নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি লুপ্ত হয়, অথবা যোগাযোগমন্ত্রী নিরুপায় হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিশিষ্ট আত্মীয়-সভায় যোগদান করে জনরোষ এড়ান। আমরা দেখি বিস্তৃত সেতুর নিচে জলস্রোত নদী শাসনের প্রকোপে নিশ্চিহ্ন; নদীর হত্যাযজ্ঞ শেষ হলে দেখি নিশ্চিহ্ন একটি জনপদ, দেখি নিশ্চিহ্ন বৃক্ষ ও মানুষ, দেখি নিশ্চিহ্ন আমাদের তাবৎ স্মৃতি ও স্বপ্নের আঁধার। সেতুর মাঝখানে কখনো দেখি অজ্ঞাত মোটরগাড়ি, মোটরবাইক সন্ধ্যা সন্ধ্যা অথবা তারাভরা মধ্যরাতে সামান্য সময় থামে–তারপর গোপন স্যুটকেস-গোপন ব্যাগ থেকে ক্ষমতা দখলের সরল হিংসায় টুকরো করা মানুষের লাশ ঝুরঝুর বালির মতো, ঘাসপাতার মতো সেতুর রেলিংয়ে ভর দিয়ে অনেক নিচে উড়িয়ে দেওয়া হয়। সেতু বিষয়ে এইসব অদ্ভুত-অপ্রয়োজনীয় গল্পগাছা জমা হলে, ইলিয়াসের 'সংস্কৃতি' নামক প্রাচীন সেতুটি আমাদের কাছে অচিরেই নতুন এক ব্যাখ্যান নিয়ে হাজির হয়। কথাগুলো বুঝবার জন্য– পাঠ্যপুস্তকের সংস্কৃতিবিষয়ক অধ্যায়টি জেরোক্স করে তখন সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং নিয়ামকগুলো মনে মনে আওড়াই : কালচার ট্রেইট এবং কালচার কমপ্লেক্স, দুটি আলাদা উপাদান। বলি সংস্কৃতি মানুষ অর্জন করে, সংস্কৃতি তৈরিতে মানুষের অংশগ্রহণ থাকে, সংস্কৃতি তৈরি হয় সমাজের হাতে, সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজ দ্বারা, সংস্কৃতির মধ্যে অনিবার্যভাবে দ্বন্দ্ব থাকে এবং সংস্কৃতি সর্বজনীন তথা বিনিময়যোগ্য। আমরা শিখি সংস্কৃতির ব্যাপ্তি, সংস্কৃতির পশ্চাৎপদতা এবং 'অ্যাকালচারেশন'-এর গলিঘোঁজ। আমরা শিখি সংস্কৃতি একটি ইন্ডাস্ট্রি বটে,...কালচার ইন্ডাস্ট্রি। ততদিনে বিপুল সব সাহিত্যতত্ত্বের পাশাপাশি সংস্কৃতিপাঠ তথা 'কালচারাল স্টাডিজ' নামক প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে পশ্চিমা বিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগে। অধ্যাপক বন্ধুরা বললেন, এই বিভাগের মৌল কাজ সংস্কৃতির নানা সেতুবন্ধ খুঁজে বের করা। আরেকটু বিস্তৃত করে বলা যায়– রাষ্ট্রক্ষমতা, মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি এবং বহুজাগতিক কর্পোরেশনের নিগড়ে সাংস্কৃতিক উৎপাদনযজ্ঞ কিভাবে কাজ করে এবং কিভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় চিহ্নিত করা হয়, তা আরো বিশদ বুঝিয়ে বলা। এই ভাবনা-বলয়কে আরো একটু বিস্তৃত করে স্টুয়ার্ট হল 'রিপ্রেজেনটেশন'-এর কথা বলতে শুরু করেন; তাঁর ধারণায় সংস্কৃতি-বলয়ে থাকে এক ধরনের 'সার্কিট', যেখানে ভাষার মাধ্যমে তৈরি হয় আমাদের অর্থ খোঁজার চেষ্টা। অন্য কথায়, বাক্য-ভাষায় এই অর্থ আমরা তৈরি করি, ভোগ করি, নিয়ন্ত্রণ করি এবং অন্য চিন্তকদের প্রতিস্থাপন করি।

চিন্তকদের মধ্যে বিকাশমান এইসব তত্ত্ব-তালাশের হুজ্জতেই ইলিয়াস হয়তো ভেবেছিলেন, *'সংস্কৃতি নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আজকাল বড় গোল দেখা যায়।' এই গোলমেলে সংস্কৃতি উদ্‌যাপন পর্ষদ থেকে আমরা এবার আমাদের ভাঙা জীবনের ভেতরবাড়িতে ঢুকে পড়ি; অথবা পুত্রদর্শনের পর ইলিয়াসকে ভ্রমণসঙ্গী করলে আমরা জড়িয়ে যাই ইলিয়াসের ব্যক্তিগত ভ্রমণ বৃত্তান্তে– 'শহর-এলাকায় তো বটেই, নিম-শহুরে জায়গাগুলোতেও সচ্ছল, এমনকি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা রঙবেরঙের নানারকম রম্য পত্রিকা, টিভি, ফিল্ম ও ভিসিআরের কল্যাণে অপসংস্কৃতির চর্চা প্রাণভরে দেখে এবং নিজেদের জীবনে যথাযথ প্রয়োগের জন্য একনিষ্ঠ সাধনা চালায়। এই সাধনা আবার বিনা খরচায় হয় না, এর জন্য পয়সা দরকার। সদাপরিবর্তনশীল কাটছাঁটের কাপড়চোপড়, স্টিকার, চেন ইত্যাদি তো বটেই, কোকাকোলা থেকে শুরু করে মদ, গাঁজা, চরস, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, টিভি, ভিসিআর, হোন্ডা, গাড়ি–যে যেমন পারে, প্রভৃতি উপাদান ছাড়া এই সাধনা অব্যাহত রাখা বড় কঠিন। এখানে কটা বাপ-মা আছে যারা নিয়মিত এসবের জোগান দিতে পারে? তা সে ব্যাপারেও সাহায্য করার জন্য আমাদের টিভি ও সিনেমাওয়ালারা সদাপ্রস্তুত। হাইজ্যাক, চুরি, ডাকাতি, মারামারি, লম্ফঝম্ফ প্রভৃতির ছবি দেখিয়ে যুবসম্প্রদায়কে এরা অর্থসংগ্রহের শর্টকাট পথ রপ্ত করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এতে পয়সা কামানো চলে, অন্যদিকে পয়সা কামাবার পদ্ধতিটাও ঐ ধরনের সংস্কৃতিচর্চার অবিচ্ছিন্ন অংশ। অর্থাগম হচ্ছে দেখে এদের রক্ষণশীল ও রুচিশীল বাপ-মাও চুপচাপ থাকাটাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন।'* এই বুদ্ধিমানদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর, যাঁদেরকে আমরা বলি বুদ্ধিজীবী, তাঁদের রকমফের দেখেও ইলিয়াস তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ– *"সমাজের অগ্রসর অংশ বলে এই নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের অনুশোচনার অন্ত নেই। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁরা এতই সোচ্চার যে এটাকে তাঁরা বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির পবিত্র গোদুগ্ধের ভাঁড়ে বিপুল পরিমাণ গোচোনা বলে ঠাহর করে ফেলেছেন।...অপসংস্কৃতি প্রচারের দুর্জয় ঘাঁটি টেলিভিশন পর্যন্ত এই নিয়ে আফসোস করার জন্য তাঁদের হায়ার করতে শুরু করেছে। আমাদের কোনো কোনো বীরপুরুষ বুদ্ধিজীবী টেলিভিশনের পর্দায় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে চাপাচাপি করে দুটো পয়সা ও নাম কামাতে এতটুকু পেছপা হচ্ছে না। এখন ক্যান্টনমেন্ট যেমন গণতন্ত্র বিতরণের দাতব্য কেন্দ্র, দরিদ্র ও শূদ্র দেশবাসীকে খাঁটি নির্জলা গণতন্ত্র সরবরাহের হুংকার শোনা যায় সেখান থেকেই, নানারকম লম্ফঝম্ফ, ছ্যাবলামো, ভাঁড়ামো ও ইয়ার্কির ফাঁকে ফাঁকে, টেলিভিশনে তেমনি ঘোষিত হয় সুস্থ সংস্কৃতি প্রচারের সংকল্প। তো সিনেমাই-বা বাদ থাকে কেন? ঢাকায় এখন ধর্মভাবদীপ্ত ফাইটিং ছবি তৈরির মহড়া চলছে, ভরসা করি, এমন ছবির মহড়া নিশ্চয়ই চলছে যেখানে কুংফু বা কারাতে-পটু বাঙালি সংস্কৃতিচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ কোনো বাহাদুর পীরের পড়া-পানি সেবন করে তার আঁটোসাঁটো প্যান্ট-গেঞ্জি পরা প্রেমিকাকে বুকে জড়িয়ে 'দম-মাওলা' বলে একটা হাঁক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে 'অপসংস্কৃতি' নামক দানবের ওপর।"*

> মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্রই বটে, যন্তরমন্তর ঘরে আমি আমার শরীর সেঁদিয়ে বদলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকি। যখন বেরিয়ে আসি, তখন ফজল মিয়ার বুলি আমারও বুলি হয়ে যায়–'ভরপেট নাও খাই, রাজকর দেয়া চাই/বাকি রাখা খাজনা, মোটে ভালো কাজ না/যায় যদি যাক প্রাণ, হীরকের রাজা ভগবান।' রাজন্যবর্গ কী প্রক্রিয়ায় 'ভগবান' হয়ে ওঠেন, তার খানিকটা ব্যাখ্যা ইলিয়াস-পাঠশালায়ও তৈরি হয়

চলচ্চিত্রের এই আঁধার জগতে, তথা চলচ্চিত্র সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়া গোপন মাফিয়াচক্রের আস্ফালন দেখে তারকাভস্কি একবার অসহায় হয়ে পড়েছিলেন– *'কোথায় হারিয়ে গেল কবিতা? শুধু টাকা, টাকা আর ভয়,... ।'* মহাজনদের এইসব উচ্চারণ এবং ভাবনা-চিন্তা ধার করে, মনের ভেতর, বুকের ভেতর, কিংবা মস্তিষ্কের ব্লাইন্ডগুলিতে জমে থাকা বিবিধ কাকোফোনি জোড়াতালি দিয়ে আমি এবার প্রবন্ধ লেখার টুলস জোগাড় করি। হয়তো চেয়েছি–শিরোনাম বদল করে আমার নিজের পাঠের জন্যই ইন্ট্রোডাকটরি সিরিজে অনেকগুলো বই লিখে ফেলি; হয়তো নাম দেওয়া যায়– সংস্কৃতির ভাঙা সেতু ও আমাদের কালচার ইন্ডাস্ট্রি, নাম দেওয়া যায়– ইলিয়াসের কৌতুক এবং ক্রোধের শক্তি, ইলিয়াসের গান্ধী-ভাবনা, ইলিয়াসের রাষ্ট্রচিন্তা, ইলিয়াসের বাঙালি মুসলমান, ইলিয়াসের সমাজ-ভাবনা, ইলিয়াসের প্রতিরোধ-ক্ষমতা, ইলিয়াসের উপন্যাস-ভাবনা, ইলিয়াসের সৃজনশীলতা, ইলিয়াসের ব্যক্তিগত 'সন্দীপন পাঠশালা' অথবা যৌথ উদ্যোগে বই পড়তে পড়তে, বই লিখতে লিখতে ভাবনার জীবাশ্ম খুজতে খুঁজতে খানিকটা তর্কও করা যায়– রাষ্ট্র নিয়ে, সাহিত্যের তত্ত্ব নিয়ে, মার্ক্সের পর মার্ক্স নিয়ে, সমাজতন্ত্র হত্যা করার পর আবার গণতন্ত্রের হাইব্রিড-প্রযুক্তির পথঘাট নিয়ে অথবা রাষ্ট্র-ভাবনাটিকেই লুপ্ত করে হালের অ্যানার্কিস্টরা এখন যা বলতে চাইছেন, মানুষের সেই মৌল-স্বাধীনতার বীজাণু নিয়েই এন্তার কথা বলা যায়, অথবা তক্ষুনি প্রশ্ন আসে–মানুষ কি সত্যিই শেষ পর্যন্ত স্বাধীন, সত্যিই কি রাষ্ট্র নামক দানবের তাণ্ডব এড়াতে পারছি, ইলিয়াস-কথিত সেই 'রাগী চোখের স্বপ্ন' দিয়ে? বা আরও স্পষ্ট অর্থে–ঠিক এই মুহূর্তের বাংলাদেশে আমাদের বাঁচাটা– আমাদের জীবনযাপনটা সহনীয় করার বিশেষ কোনো উপায় কি জানতে পারছি? বলতে কি, ইলিয়াস স্পর্শ করলে, ইলিয়াস বিদ্যাপীঠের চেয়ার-বেঞ্চে নিজেকে প্রতিস্থাপন করলে, এমনিতর সব বিষয় এসে ভিড় করে, ভাবনার প্রণোদনা তৈরি করে, অথবা প্রণোদনা জাগতে জাগতে হঠাৎই আমাদের অপুষ্ট-রুগ্ণ-বিকারগ্রস্ত মনে ভয়মিশ্রিত উদ্বেগ ভেসে ওঠে, এক ধরনের 'অ্যাংগস্ট' বটে! ডিলেইড মাইলস্টোনস এবং আন্ডার ডেভেলপ্ড শরীরের অভিশাপ নিয়ে ইলিয়াসের তৈরি সেতুতে পা পড়লে শরীর টলকে যায়, নড়বড়ে-ভাঙা সেতুতে শরীর টলমল হয়; মনে হয় ভাঙা সেতুর একেবারে মাঝখানে, সামনে-পেছনে কোথাও এগোতে পারছি না, এগোনো হয়তো শিখিনি, শিখতে চাইনি, আর জলহীন-শূন্য-গভীর খাদের দিকে চোখ পড়ামাত্রই রাজ্যের ভয় এসে জাপ্টে ধরছে। আমি এবং আমার বন্ধুরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে ভাসা ভাসা কথা বলি। কেউ গেণ্ডাবাল পরিস্থিতি বর্ণনার ফাঁকে নিজেদের পরিচয় অথবা আইডেন্টিটি নিয়ে কথা বলি–আমরা সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং উপনিবেশ বর্ণনার প্রেক্ষিতে নিজেদেরকে বুঝতে চাই, আমরা কথা বলি ভুবনগ্রাম অথবা ভার্চুয়াল রিয়ালিটির অধরা জগৎ নিয়ে–আমরা বলি, যোগাযোগচক্র-তথ্য সড়ক, আমাদের পরিচয়, আমাদের অনেক ধারণা নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে; গ্লোবাল সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক 'ডায়াস্পোরা'–এই আলোচনা উস্কে দেওয়ার জন্য বিশিষ্ট তাত্ত্বিক বিল ইপন্টেইন উদ্ধৃত করে তখন মিডিয়া স্টাডিজ পড়ুয়া আমাদের তরুণ বন্ধু শেখান– *None of us has just a single identity; as members of society each of us carries simultaneously a range of identities just as each of us occupies a number of statuses and plays a variety of roles.* আলোচনা-তর্কের এইসব বিবিধ ডামাডোলে আমাদের বদলে যাওয়া আদল নিয়ে, পরিচয় নিয়ে এবার সত্যিই ধন্দে পড়ি, অথবা বিচিত্র চেহারার মানুষ হয়ে, কালো চামড়া-সাদা মুখোশ (Black Skin-White Mask) হয়ে নিজের স্ব-উদ্ভাবিত পথে, হয়তো নিতান্তই ঘোরলাগা কুয়াশাচ্ছন্ন পথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেতুপথ খুঁজি, অথবা তথ্য জমাই; অথবা কোকাকোলা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সুরম্য যুবক- যুবতীদের 'ইমেজ' পান করি এবং অষ্টপ্রহর টেলিভিশনে বুঁদ হয়ে থাকি; কারণ আনলেস ইট ইজ ইন টিভি, ইট ইজ নট ট্রু...। সত্য জানার দুর্দমনীয় স্পৃহা নিয়ে আমরা অতঃপর টেলিভিশনের আলো থেকে চোখ ফেরাতে ব্যর্থ হই। আমরা সুপ্রচুর খাদ্য গ্রহণ করি এবং ওবেসিটি নামক ইটিং ডিজর্ডারের জন্ম দিতে দিতে, আবারও ইলিয়াসের ভাঙা সেতু হয়ে তথ্য সড়কের পাঁকে নিশ্চিহ্ন হতে থাকি। টেলিভিশন বলেন– শ্রমজীবী মানুষের আইডেন্টিটিও বদলে যাচ্ছে। আমাদের বাজারে মার্কিন পণ্য ও পুঁজি আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে অবাধ প্রবেশ করছে। আর নবপ্রজন্মের এই নতুন শ্রমিকশ্রেণি ঝকঝকে ইংরেজি বলতে বলতে ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে স্থান-কাল-সময় বিস্মৃত হয়ে। লক্ষ করি, 'অ্যাসাইনমেন্ট ও ডেট-লাইন'-এর জটাজাল থেকে কখনো সংবিৎ ফিরে পেলে এরা তখন কথা বলে 'স্ট্রেস' নিয়ে– বিহেভিয়ারল, ইন্টারপার্সোনাল এবং লাগাতার ফিজিক্যাল স্ট্রেস! এই স্ট্রেস কখনো আমাদের মলিন ঘরবাড়ি-উঠোন হয়ে প্রতিস্থাপিত হয় প্রতিবেশ ও জৈবপ্রযুক্তির জগতে। আমরা 'বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার'-এর কথা সামান্য বিস্মৃত হয়ে বায়োটেকনোলজিক্যাল বিপ্লব নিয়ে কথা বলি। আমাদের জ্ঞানময়-তরুণ বন্ধুরা কথা তোলেন হিউম্যান ইকোলজি, সোশ্যাল ইকোলজি ও কালচারাল ইকোলজি বিষয়ে। পুঁজিবাদ, প্রযুক্তি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও ইকোলজিক্যাল ডেব্ট নিয়ে কথা বলতে বলতে, কথার সপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য এঙ্গেলসের (Dialectics of Nature) উদ্ধৃতি জোগাড় করেন আমাদের কোনো অ্যাক্টিভিস্ট বন্ধু–প্রকৃতির ওপর মানুষের যেকোনো ধরনের বিজয়ের প্রশ্নে আমাদের আর যা-ই হোক, খুব বেশি উৎফুল্ল না হওয়াই ভালো–

> আমরা দেখি, ফতোয়া জারির প্রকোপ বাড়ছে, বাধ্যতামূলক আনুগত্য তৈরির জন্য ধর্মের ব্যবহার বাড়ছে, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি হয়েছে, বাতাসে ভাসমান জায়নামাজ জুড়ে চলছে আর্ট অব কিলিং, কাফের হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে আহমদিয়া গোষ্ঠী, পার্বত্য অঞ্চলে সামরিক উৎপীড়ন ঘটিয়ে প্রান্তিকতা তৈরি হচ্ছে, নিরুদ্দেশ হচ্ছে হাজার বছরের সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ; আর সামাজিক বনায়নের জের ধরে উদ্বাস্তু হতে চলেছে সমস্ত মান্দি ও গারো জনগোষ্ঠী।

... Let us not, however, flatter ourselves overmuch on the account of our human victories over nature. For each such victory, it is true, in the first place bring about the results we expected, but in the second and third places it has quite different, unforeseen effects which only too often cancel the first....We, with flesh, blood and brain belong to nature and exist in its midst, and that all our mastery of it's consists in the fact that we have the advantage over all other creatures of being able to learn its law and apply them correctly.

এঙ্গেলসের দীর্ঘ উদ্ধৃতি যিনি আমার জন্য বাংলায় অনুবাদ করেন, তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা বাড়ে। হয়তো হঠাৎই সুডোস্কলার হওয়ার লোভে অথবা তাঁর সঙ্গে কথা বাড়তে হবে–এই ইচ্ছায় ইহজাগতিকতা, ব্রুনোর আত্মত্যাগ, ধর্মানুভূতি, লিবারেশন থিয়োলজি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদ বিষয়ে হোমওয়ার্ক করি। অথবা অস্পষ্ট-পাকস্থলীতে আত্তিকরণ বিভ্রাটের অগ্রিম ভয় নিয়ে টেলিভিশন খুলি– টেলিভিশনে মহাশ্বেতা দেবী তামিলনাড়ুর ইরুলা আদিবাসী নিয়ে কথা বলছেন; বেসরকারি সাহায্য সংস্থা উন্নয়নের রাজনীতি সম্পর্কে ন্যূনতম আলোকপাত না করে ইরুলাদের সকল ভেষজ গাছের সিড-ব্যাংক তৈরি করে ফেলেছে ইতোমধ্যে; এবার ফোক মেডিসিন প্রতিস্থাপিত হবে বহুজাতিক পেটেন্ট-

রাইটের গোপন নিগড়ে। ইরুলা কয়েক পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেদক কথা বলতে বলতে, টেলিভিশনের কাচজুড়ে, সুগন্ধি সাবান কোম্পানির উস্কানিতে বিউটি প্যারেড নামে, মিস ইউনিভার্স কফিতে রঙিন ওষ্ঠ ছুঁয়ে আমাদেরকে একঝলক দেখেন; আর তখনই কাচজুড়ে 'সুইসাইড-বোম্ব' এসে আমাদের টিভি দেখার আনন্দ হত্যা করতে উদ্যত হয়। সুসান সুনটাগের উদ্ধৃতিতে ফটোগ্রাফির 'ক্ষমতা' এবং টিভির ভেতর হত্যা উৎসবের ব্যাখ্যাটি এবার আরও স্পষ্ট আন্দাজ করা যায়–

Photographs have the kind of authority over imagination today, which the printed word had yesterday and the spoken, word before that. They seem utterly real.

ততক্ষণে টিভিতে মাংস পোড়ার বাস্তব গন্ধ, ঘরবাড়ি পোড়ার বাস্তব আগুন-ধোঁয়া নিশ্চিত হলে, শহরের শ্রেষ্ঠ অ্যানার্কিস্ট, অ্যাক্টিভিস্ট, নৃতত্ত্ববিদ এবং কালচারাল স্টাডির, থিওরিস্টবৃন্দ অরুন্ধতী-চমস্কি-মামদানি-তালাল আসাদ-জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের দোহাই দিয়ে ইসলাম-আমেরিকা-সন্ত্রাস এবং ভালো মুসলমান-মন্দ মুসলমান নিয়ে বিপুল 'হার্ড টক'-এ জড়িয়ে গেলে, এঁদের যুক্তির তীক্ষ্ণতা আমাকে হীনম্মন্য করে। আমার স্বল্পবিদ্যা তার ভয়ংকরত্ব প্রমাণের জন্য খাতায় মিছেমিছি এবার ডুডল করে–জিয়োগ্রাফি অব অ্যাঙ্গার,...ক্রোধের ভূগোল; হয়তো অর্জুন আপাডুরাইয়ের গ্রন্থটি কখনো হাতে পাব, এই ইচ্ছায় শিরোনাম টুকে ফেলি–'ফিয়ার অব স্মল নাম্বার'। সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু মনস্তত্ত্ব–এ সম্পর্কেও দু-এক কথা ভেবে বের করি। আমার অস্পষ্ট-আত্মা সংস্কৃতি নামক সেতুর ভাঙা পথ বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এবার নিজের দেশ-গ্রাম দেখতে থাকে। মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্রই বটে, যন্তরমন্তর ঘরে আমি আমার শরীর সেঁদিয়ে বদলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকি। যখন বেরিয়ে আসি, তখন ফজল মিয়ার বুলি আমারও বুলি হয়ে যায়– *'ভরপেট নাও খাই, রাজকর দেয়া চাই/বাকি রাখা খাজনা, মোটে ভালো কাজ না/যায় যদি যাক প্রাণ, হীরকের রাজা ভগবান।'* রাজন্যবর্গ কী প্রক্রিয়ায় 'ভগবান' হয়ে ওঠেন, তার খানিকটা ব্যাখ্যা ইলিয়াস-পাঠশালায়ও তৈরি হয়– *'মিলিটারি এসে গোটা দেশের মুখে লাগাম পরিয়ে অ্যায়সা টাইট করে টেনে ধরল যে, দেশবাসী দেখল কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয় কোনো ব্যাপার তাদের কিছু করার নেই। মিলিটারির কাছে রাজনীতি নিছক উপদ্রব।...রাজনীতি বন্ধ হল, মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশ, বিদ্যাচর্চা, মননশীলতা– এসবকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য মিলিটারির ডাণ্ডা ঘুরতে শুরু করল বোঁ বোঁ করে।'* এই ঘূর্ণনচক্রে মিলিটারি একবার আসে, একবার ফিরে যায়। কিন্তু গোপনে গোপনে মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি, সিভিল সোসাইটি এবং হঠাৎ-উদ্ভূত-হওয়া ধনকুবেরবৃন্দের যোগসাজশে তৈরি হয় অদ্ভুত এক গোঁজামিল রাষ্ট্রযন্ত্র; ইলিয়াসের চোখে রাগ জমতে থাকে, চোখের অনেক ভেতরে খানিকটা ক্রোধ ও কৌতুকও বটে– ইলিয়াস আমাদের 'গ্রাম উন্নয়ন'-এর নমুনা ও চিহ্ন খুলে দেখান– *'ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে চাষাভুষারা বসে বসে টেলিভিশনের পর্দায় আমেরিকানদের সাম্প্রতিক জীবনযাপন দেখে, সেখানকার মেয়ে-পুরুষ সব তীব্র গতিতে গাড়ী চালায়, রকেট ছোড়ে, তাদের একটি প্রধান চরিত্রের নাম কম্পিউটার, তার কীর্তিকলাপও বিস্তারিত দেখা যায়। বাড়ি ফিরে ঐ চাষি পায়খানা করে ডোবার ধারে, ঐ ডোবার পানি সে খায় অঞ্জলি ভরে, ...রবীন্দ্রনাথের সময় বাংলার গ্রাম এই-ই ছিল, তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষকের যে বিবরণ লিখে গেছেন, তাতে এই একই পরিচয় পাই, পরে শরৎচন্দ্র কৃষকের ছবি আঁকেন, তাতেও তেমন হেরফের কই? তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি সেদিনের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যে চাষিকে দেখেছিলেন সেও তাদেরই আত্মীয়।'* ...উন্নয়নের রাজনীতি দেখতে দেখতে, ইলিয়াসের ক্ষোভ আরও বেগবান হয়; তখন নেতৃবৃন্দ এবং সাহায্য সংস্থার অধিপতিবৃন্দের অসাড়তা নিয়ে জরুরি প্রশ্ন আনেন পুনর্বিবেচনার জন্য– *'রাজনীতি আজ ছিনতাই করে নিয়েছে কোটিপতির দল। এদের পিছে পিছে ঘোরাই এখন নিম্নবিত্ত মানুষের প্রধান রাজনৈতিক তৎপরতা। ...এনজিওতে দেশ ছেয়ে গেল, নিরন্ন মানুষের প্রতি তাদের উপদেশ: তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও, কী করে?–না, মুরগি পোষো, মুড়ি বানাও, কাঁথা সেলাই করো। ভাইসব, তোমাদের সম্পদ নেই; মুরগি পুষে, ডিম বেচে, ঝুড়ি বেচে তোমরা স্বাবলম্বী হও।'* শুধু তা-ই নয়, *'...ছাত্রদের হাতে অস্ত্র সরবরাহ করে মস্তানি ধর্মে তাদের দীক্ষিত করার কাজে লিপ্ত ছিল মন্ত্রী, নিমমন্ত্রী এবং তাদের সাগরেদরা। শ্রমিকদের পর্যন্ত ঘুষ দেওয়ার জন্য এরা টাকা বরাদ্দ করে রাখত। এমনকী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে হাত করার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সবই করেছে। এর সঙ্গে চলেছে নির্যাতন। কথায় কথায় মানুষ খুন করতে এদের জুড়ি ছিল না।...এক হাতে গুলি করে হত্যা করে অন্য হাতে নিহত মানুষের আত্মীয়-পরিজনদের পিঠে হাত বোলাতে এরা ওস্তাদ।'*

এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিস্তৃত হতে হতে পুনরুত্থানের গৌরবে অভিষিক্ত 'ক্রসফায়ার' পর্যন্ত ছড়িয়ে গেলে, ইলিয়াসকে অবলম্বন করে 'ভয়ের সংস্কৃতি' নামক নতুন এক সেতু পারাপারের পথ তৈরি হয় আমাদের লোক-পরিসরে। আমরা দেখি, ফতোয়া জারির প্রকোপ বাড়ছে, বাধ্যতামূলক আনুগত্য তৈরির জন্য ধর্মের ব্যবহার বাড়ছে, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি হয়েছে, বাতাসে ভাসমান জায়নামাজ জুড়ে চলছে আর্ট অব কিলিং, কাফের হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে আহমদিয়া গোষ্ঠী, পার্বত্য অঞ্চলে সামরিক উৎপীড়ন ঘটিয়ে প্রান্তিকতা তৈরি হচ্ছে, নিরুদ্দেশ হচ্ছে হাজার বছরের সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ; আর সামাজিক বনায়নের জের ধরে উদ্বাস্তু হতে চলেছে সমস্ত মান্দি ও গারো জনগোষ্ঠী। অর্থনীতির উপাত্তে দেখা যায়, আমাদের আইনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার চিত্রটিও একই রকম নৈরাজ্য ও নৈরাজ্যময়: গবেষকদের লেখায় পড়ছি (আকবর আলি খান, অন্ধকারের উৎস হতে), একটি বছরে দায়েরকৃত মামলায় মাত্র ১১.৬ শতাংশ আসামির সাজা হয়েছে, ধর্ষণের মামলায় মাত্র ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে, মাত্র ১২.৫ শতাংশ ধর্ষণ মামলায় সাজা হয় আর জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত মামলা হাইকোর্ট-আপিল বিভাগ হয়ে নিষ্পত্তিতে সময় লাগছে গড়ে ২৯ বছর; এই দুর্যোগের, এই অনিয়মের তালিকা আরও দীর্ঘ করা গেলেও সহজে বোঝা যায় অপরাপর গণপরিসরেও একই হতাশাব্যঞ্জক বাস্তবতা।

> এগলি-সেগলি হয়ে, বিবিধ ল্যাবিরিন্থ পেরিয়ে অনুভব হয়–একটু একটু করে ভয় সরে যাচ্ছে, খানিকটা সাহস হয়; আবার অক্ষমতার বেদনাও বটে, কারণ ইলিয়াসের মতো নিশ্চয় আমি দেখতে শিখিনি।

মনোযোগ সরিয়ে কিংবা হতাশা এড়াতে, অথবা হতাশাতেই ফের ডুবতে ডুবতে এবার রাষ্ট্রের অন্য সব প্রতিবেশে ভাসা ভাসা জ্ঞানবুদ্ধি ছড়াই–দেখি শেভরনের সিসমিক জরিপে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে তৈরি হচ্ছে নতুন সংকট। এফএওর বরাতে জানা যাচ্ছে, আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠী খাদ্য-নিরাপত্তাহীনতার দিকে এগোচ্ছে। জানা যাচ্ছে, আমাদের প্রধানতম প্রাকৃতিক সম্পদ তেল, গ্যাস ও কয়লা লোপাটের জন্য নতুন নতুন চক্র এবং ইকোনমিক হিটম্যান আবির্ভূত হচ্ছে। আমরা ব্যর্থ হচ্ছি আমাদের পানির হিস্যা সঠিকভাবে বুঝে নিতে, ব্যর্থ হচ্ছি পরিবেশবিনাশী সকল বাঁধ তৈরির প্রকল্প রুখতে, ব্যর্থ হয়েছি অহিংস বুদ্ধের জনপদে হিংসার আগুন নির্বাপিত করতে, বার্মিজ সেই প্রবাদটি বিস্মৃত হয়েই– The Pagoda is finished; the country is ruined. ব্যর্থ হয়েছি পার্বত্য জনপদের কল্পনা চাকমা নামক সেই অবিস্মরণীয় কন্যার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে। ব্যর্থ হচ্ছি ১২ লাখ আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষকে সুপেয় পানির নিশ্চয়তা দিতে। ব্যর্থ হচ্ছি হাইব্রিড ও জিই বীজ বেচাবিক্রির বহুজাতিক চক্রান্তকে পরাস্ত করতে। ব্যর্থ হচ্ছি জ্বালানি ও

বিদ্যুৎ খাতের লুটপাট বন্ধ করতে, ব্যর্থ হচ্ছি সরকারি রাজকোষ লুণ্ঠনের সু-উজ্জ্বল 'হলমার্ক' আঁকা ৪৫০০ কোটি টাকার পুনরুদ্ধারকর্মে। এমনকি সকল স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির কাছে দেশের অবশিষ্ট সম্পদ ইজারা দিতেও আজ কুণ্ঠিত নই।

বলা যায়, আত্মপীড়ন-আত্মহননের সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে, এই অপরূপ-মনোটোনাস সৃজনশীলতার দাবদাহে ভিটেমাটি ধ্বংস করে, নিশ্চিহ্ন করে, উদ্বাস্তুর মতো সংস্কৃতির ভাঙা সেতু ধরে এবার যখন এগোচ্ছি, যখন তীব্র পতনপর্ব, প্রকারান্তরে আমাদের ভয়ের সংস্কৃতিকেই জাগ্রত করে। ভয়ের এই সংস্কৃতিকে জল-হাওয়া দিয়ে নিশ্চয়ই আরও বেগবান করা সম্ভব। ডুবে যেতে যেতে একবার ভাবি, তাহলে মানুষ বাঁচে কিভাবে? এই সুতীব্র আঁধারকালে, তীব্র হাহাকার-শূন্যতার ভেতর হঠাৎ যেন দূরের বাতিঘর চুইয়ে পড়া আলোকবিন্দু দেখতে পাই। ইলিয়াস অভয়বাণী শোনান– *'ঘোরতর বিপর্যয়েও মানুষ বাঁচে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলেও বাঁচা যায়। বাঁচার ইচ্ছা যদি তীব্র হয় তাহলে তা-ই পরিণত হয় সংকল্পে। তখন মৃত্যুর আতঙ্ক মাথা নত করে।'* তখন রোজা লুক্সেমবার্গ প্রেরণা ছড়ান–আমরা হারতে হারতে আবার বিজয় অর্জন করি, ...you lose, you lose, you win। স্বপ্নের জাল ছড়িয়ে জয়ের স্বপ্ন নিয়ে এগোতে এগোতে এবেলা ইলিয়াস রাজনৈতিক কর্মীর বিচ্ছিন্নতা দেখে প্রশ্নবিদ্ধ হন– *'আজ অনেক রাজনৈতিককর্মী নিজেদের সংগ্রামী তৎপরতাকে নিষ্ফল ভাবতে শুরু করেছেন। বামপন্থীকর্মীদের অনেকেই আজ হতাশ ও বিচলিত। বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনের অধঃপতন যে কোথায় নেমেছে তা বোঝা যায় যখন দেখি যে এরা আজ যেকোনো ডানপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল ও গণশত্রু দলগুলোর সঙ্গে জোট পাকাতে এতটুকু ইতঃস্তত করে না।'* ইলিয়াস এই বিভ্রম এড়ানোর খানিকটা চিকিৎসাও বাতলে দেন তক্ষুনি– *'শ্রমজীবীর প্রতি মর্যাদাবোধ না থাকলে বামপন্থী আন্দোলন চালানোর উৎসাহ কি শেষ পর্যন্ত টেকে? বরং তাঁদের প্রতি এই মর্যাদাবোধ নিয়ে এগিয়ে এলে বামপন্থী রাজনীতিবিদ বা কর্মী ইতিহাসের সবল ধারায় নিজেকে প্রয়োগ করার সুযোগ লাভ করবেন।'*

আমাদের সময়, আমাদের কাল সাক্ষ্য দেয়–ইলিয়াস শ্রমজীবী মানুষের সেই মর্যাদা তৈরির লড়াইয়ে নিজেকে প্রয়োগ করেছেন তাঁর সর্বোচ্চ মেধা ও দায়িত্বশীলতা দিয়ে। ইলিয়াস ভাবতেন আন্তন চেখভের শিক্ষককে, *'যিনি গ্রামের মানুষের যেকোনো সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারেন এবং দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের সংকটে তাঁদের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন সর্বাগ্রে'*। জগন্নাথ কলেজে যোগদান করে তিনি আরেক জাত শিক্ষক অজিতকুমার গুহর দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন– *'কলেজের কাজকে চাকরি বলে গণ্য কোরো না। শিক্ষকতা কিন্তু চাকরি নয়, ক্রিয়েটিভ কাজ।'* সময় প্রমাণ করে, শিক্ষকতাকে তিনি আইনস্টাইন-কথিত সেই আকাঙ্ক্ষিত সৃজনশীলতার স্তরেই উত্তীর্ণ করেন : *It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.* ইলিয়াস নামক মহাশ্বেতা দেবীর এই 'মাষ্টারসাব', আমরা লক্ষ করি–এভাবেই হয়ে ওঠেন এক আশাজাগানিয়া মানুষ। মহাশ্বেতা বলেন, *'এমন একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব আর দেখিনি। ...যুধ্যমান এক সৈনিক, যার অস্ত্র ছিল কলম।'*

ট্রটস্কির কথাটি স্মরণ করুন– *'মূলত আমি কলম হাতে নিয়েই ১৮৯৭ সাল থেকে যুদ্ধ চালিয়েছি।'* বলতে কি, এরকম এক নায়কোচিত কলম দিয়ে (ইলিয়াস কলমের নাম ছিল Hero) গল্প-উপন্যাস লেখার বাইরে ইলিয়াস আমাদের সংস্কৃতির ভেঙে পড়া সেতুর দুর্গতি নিয়ে লিখেছেন বিস্তর। ম্যাক্সমুলার, মেকলে, ক্লাইভ, হার্গেটি কমিশন, শিক্ষা আন্দোলন, ড্রপ আউট ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে করতে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় শিক্ষা বিষয়ক রাজনৈতিক অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবচ্ছেদকর্মটি করেছেন আমাদের স্বদেশে। শুধু তা-ই নয়, ইলিয়াস আমাদের দায়ভার ও দায়িত্ব নিয়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনাটিও তৈরি করেন একক মেধায়– *'লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের দায়িত্ব এখন পূর্বেকার যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ শত্রুর শোষণের পথ এখন বিচিত্র, মানুষকে প্রতারণার ফন্দি তাদের অজস্র। শত্রুকে রুখে দাঁড়াবার যথার্থ পথ চিহ্নিত করা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। সামরিক শাসন, মৌলবাদ এবং এদের মনিব সাম্রাজ্যবাদের আরো সব দাস ও দাসানুদাসদের প্রতিহত করার জন্য এখন কোনো তরল ও আবেগসর্বস্ব বুলি বা কর্মসূচি কোনো কাজেই আসবে না।...সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের এদেশি দাসদের প্রতিহত করার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি অনুসরণ করা আজ সবচেয়ে জরুরি বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।'*

ইলিয়াস তাই তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে স্বপ্ন দেখেন নতুন এক সমাজব্যবস্থা পত্তনের– *'আজ সমাজতান্ত্রিক নামে পরিচিত বিশ্বের একটি অংশ, যতই সংকট দেখা দিক, আমাদের এখানকার বাস্তবতা অবশ্যই নতুন সমাজব্যবস্থার জন্য উদগ্রীব।...বর্তমান সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলবার পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি হলো এই যে, সমাজের অধিকাংশ মানুষ কেবল খাওয়া-পরা থেকে বঞ্চিত নন, সংস্কৃতিশূন্য একটি জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।'* অনুভব হয়– ইলিয়াসের স্বপ্নের জাল, স্বপ্নে দড়িদড়া ভেঙে-পড়া সেতুকে এখন অনেকখানি শক্তপোক্ত করেছে। এগলি-সেগলি হয়ে, বিবিধ ল্যাবিরিন্থ পেরিয়ে অনুভব হয়– একটু একটু করে ভয় সরে যাচ্ছে, খানিকটা সাহস হয়; আবার অক্ষমতার বেদনাও বটে, কারণ ইলিয়াসের মতো নিশ্চয় আমি দেখতে শিখিনি। ইলিয়াস বলতেন, *'দেখতে গেলে লাগে চোখ। চোখ সকলের সমান নয়। সবকিছু সবখানে রয়েছে, তার মধ্যে দু-একটি জিনিস মাত্র দু-একজনের পড়ে চোখে।'* আমি পোড়া চোখের অভিসম্পাত মাথায় নিয়ে, জন্মান্ধ হওয়ার গণ্ডানি নিয়ে সাইমন বলিভারকে আশ্রয় করে বলি, *'তাহলে কি সারাজীবন সমুদ্রের পানিতেই কৃষিকাজ করে গেছি?'* আমি থমকে যাই, হতবিহ্বল হই, চিন্তাক্লিষ্ট হই, অথবা অনুভব হয়– আলোর অধিক এক আঁধার আমাদের চারপাশে। ভয়টা হয়তো বাড়তে বাড়তে তখন সটান দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার ঠিক উল্টো দিক থেকে একরত্তি একরত্তি সাহসও যেন উড়ে আসে, আমি বলি স্বাধীনতার বীজাণু– একখণ্ড ফুলবাড়ী উপাখ্যান, একখণ্ড কানসাট, একখণ্ড অগ্নিগর্ভ গার্মেন্টস, একখণ্ড বিডিআর বিদ্রোহ,...দূরের আরব বসন্ত, অক্যুপাই মুভমেন্ট, শাহবাগ স্কয়ারের জনসমুদ্র, একখণ্ড জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ– সব জমাট হয়ে তৈরি করে এক প্রতিরোধের বিশ্বময়তা, এক তীব্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। বিপুল শক্তির আধার ইলিয়াস তখন জল ছুঁই ছুঁই সেতু থেকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন সবার আগে; ডুবসাঁতারের বিপদ-আপদ থেকে এযাত্রা তাই আমাদের রক্ষা হয়, আমরা বলি–তীব্র পতনের কালে, তীব্র বিবমিষার কালে এইভাবে আমরা একদা ভয়শূন্য হয়েছিলাম। আমাদের সেই যাত্রাপথে ইলিয়াস ছিলেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, সবচেয়ে আলোকিত এক সহযোদ্ধা; ইলিয়াস ছিলেন এক আশ্চর্য 'মাষ্টারসাব', যাঁর কাছ থেকে আমরা নিয়েছিলাম অনিঃশেষ জীবনের মন্ত্র, শক্তি ও বিপুল স্বপ্নময়তা।

মামুন হুসাইন: মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও কথাশিল্পী
ইমেইল: mamun.hussain.bd@gmail.com

['বাঙলার পাঠশালা' আয়োজিত প্রথম আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারক বক্তৃতায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ২০১২]